ATHENA, VOLUME VI, JULY 2022 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 166-174
www.athenajournalcbm.in

নির্বাচিত ছোটগল্পে খরা: পরিবেশ থেকে মানবসম্পর্কে

দূর্বা প্রামাণিক*

প্রাপ্ত: ২৮/০২/২০২২ পরিমার্জন: ২১/০৩/২০২২ গৃহীত: ২০/০৪/২০২২

সংক্ষিপ্তসার: *বাংলা ছোটগল্পে খরা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গরূপেই উপস্থাপিত হয়নি; অনেক ক্ষেত্রেই খরা কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে। মাধুরীলতা দেবীর 'দ্বীপনিবাস' গল্পটিতে পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে; তিনি দেখিয়েছেন মানুষের প্রচেষ্টায় খরার নিরসন সম্ভব। মহাশ্বেতা দেবীর 'জল', সৈকত রক্ষিতের 'খরা', অমর মিত্রের 'আবহমান' গল্পগুলিতে লেখকরা খরাকে শুধু একটি প্রাকৃতিক বিষয়রূপে উপস্থাপিত করেননি; দেখিয়েছেন খরা সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের হঠকারী সিদ্ধান্ত। মানুষের অত্যধিক চাহিদার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। উষ্ণায়ন, বৃষ্টিপাত হ্রাস ইত্যাদি বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিত্তবানদের ভোগসর্বস্বতা খরাকে ত্বরান্বিত করে। অথচ খরার প্রভাব বিত্তবানদের জীবনযাপনে বিশেষ কোনো প্রভাব না ফেললেও দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তোলে। কেবলমাত্র খরার ফলে নিম্নবিত্তের জীবনজীবিকা বিঘ্নিত হয় না, বিঘ্নিত হয় তাদের পারিবারিক সম্পর্কের সমীকরণও।*

সূচক শব্দ: *পরিবেশভাবনা, অনাবৃষ্টি, বন্ধ্যা, রুক্ষ, উষ্ণায়ন, মাইক্রো-ক্লাইমেট, সুস্থায়ী উন্নয়ন, দূষণ।*

---

* পি এইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: durba.pramanik2013@gmail.com

পরিবেশ ও সাহিত্যের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ। সাহিত্যিককে চিরকালই প্রকৃতির মাধুর্য, গাম্ভীর্য প্রাণিত করে। কিন্তু সাহিত্যিক কেবলমাত্র প্রকৃতির বিমুগ্ধতাকে নিয়েই সৃজনকর্মে অগ্রসর হতে পারেন না। প্রকৃতিকে রক্ষা করার একটি সংকল্প লেখক সত্তাকে চালিত করে। পরিবেশ সংকটের চালচিত্র স্বাভাবিকভাবে স্থান করে নেয় সাহিত্যে। পরিবেশবিজ্ঞান ভৌতপরিবেশকে প্রাধান্য দেয়। জৈব ও অজৈব উপাদানের আদান-প্রদানের যাথার্থ্যে বজায় থাকে পরিবেশের ভারসাম্য। গোল বাঁধে শিল্পভিত্তিক সভ্যতার শুরুতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমির উর্বরতা হ্রাস এবং বনাঞ্চলের ধ্বংসসাধন পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। পরিবেশের উপর শিল্পবিপ্লবের প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয় ইউরোপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নিরন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির প্রয়োগে বিশৃঙ্খলা নেমে আসে পরিবেশের ভারসাম্যে। পরিবেশের সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত; সেই বিন্যাসের উলটপালটে অযোগ্য হয়ে যায় বাসভূমি। দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। ভোগ ও প্রযুক্তির বিকাশে যে শিল্প সমাজ গড়ে ওঠে প্রকৃতিকে তারা এমনভাবে মন্থন করে যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পরিবেশ আদত থাকছে কিনা সে প্রশ্ন বারে বারে উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতা থেকে শুরু করে সাহিত্যিকের রচনায়। ক্রমাগত বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন, ভূগর্ভ থেকে যথেচ্ছ জলোত্তোলন পৃথিবীতে আরও বেশি খরাপ্রবণ অঞ্চল বাড়িয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পে স্বাধীনতার পূর্বে (১৯৪৭) পরিবেশদ্রিক ছোটগল্পের নিজস্ব ধারা গড়ে ওঠেনি । তবে একটি প্রেক্ষাপট যে তৈরি হচ্ছিল তা বলাবাহুল্য। যথার্থ পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যের উৎসার ঘটে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের *আরণ্যক*-এ (১৯৩৯)। মাধুরীলতা দেবীর 'দ্বীপনিবাস' (১৩১৮), প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'দুই মিতা' (১৩৩১) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুপ্তধন' (১৩৩৪) 'বলাই' (১৩৩৫), 'ধ্বংস' (১৯৪১) সুবোধ ঘোষের 'ভাট তিলক রায়' (১৯৪৪) পরশুরামের 'গামানুষ জাতির কথা' (১৯৪৫) গল্পগুলিকে পরিবেশভাবনামূলক গল্প বলা যায়। পরিবেশকেন্দ্রিক গল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথের 'ধ্বংস', পরশুরামের 'গামানুষ জাতির কথা' যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশকে উপস্থাপিত করে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। মূলত গত শতকের সাতের দশক থেকে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্মেলনের (১৯৭২) পর পরিবেশ আইনগত দিকে, পরিকল্পনায়, কর্মসূচিতে সচেতনভাবে প্রাধান্য পেতে থাকে। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বৃক্ষরোপণ, অনাবৃষ্টি, তেজস্ক্রিয়দূষণ, বর্জ্যদূষণ, সুন্দর ও সুস্থ সুন্দর পরিবেশের প্রতি মানবের আন্তরিক আকুতি বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনায় ক্রমাগত উঠে আসতে থাকে।

খরা প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্পের ধারায় পরিবেশ সচেতনতার বার্তা রেখেছে; সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাধুরীলতা দেবীর লেখা 'দ্বীপনিবাস' গল্পটির কথা। মাধুরীলতা লিখছেন, এক নবাগত হল্যান্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে উত্তর সাগরে এক জলদস্যু অধ্যুষিত 'বন্ধ্যা' দ্বীপে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থ করেন। নবাগত বলেন, "আমাদের গাছ চাই আমরা চেষ্টা করলে এই জায়গাটি সুন্দর করিতে পারি।"[১] তিনি সংকল্প করলেন, যদি গাছ মরে যায় তবে আরো গাছ লাগাবেন। যে পঞ্চাশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন তিনি তাঁর অঙ্গীকার রাখলেন। নিষ্প্রাণ ভূমিকে সুজলা-সুফলা করে তোলবার সদিচ্ছা প্রত্যক্ষতই রয়েছে এই গল্পটিতে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর প্রাগকথনে লিখেছেন যে আদিবাসী জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন লেখায় উপাদান খোঁজার জন্য নয়। ইতিহাসকে খুঁজেছেন এবং ভারতবর্ষের মানচিত্রে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের অবস্থান যে কোথায় ছিল, কোথায় আছে, সেই অনুসন্ধান তাঁর কখনোই ফুরোয়নি। তাদের দুঃখ বঞ্চনাই তাঁকে চাবুক মেরে সিধে করে রাখে। লিখেছেন— "বিছনের দুলনকে অন্যভাবে দেখে এলাম সেদিন। পুরুলিয়া ভুরুডিতে ধূ-ধূ বন্ধ্যা জমিকে বহু বৃক্ষরোপণে সবুজ করে এক কাঠের মাচা বেঁধে অশীতিপর সাগর শবর একা বসে পাহারা দিচ্ছে।"[২]

কুরুডা ও হেসাডি গ্রামের উত্তরের জমি ঢেউ খেলানো, একেবারে শুকনো, রৌদ্রে জ্বলা। সেখানে ঘাস জন্মায় না। মাঝে মাঝে ফণীমনসার জঙ্গল ফণা তুলে থাকে। কয়েকটি নিম গাছ আছে। একটি ডোঙা আকারের আধ বিঘা নাবাল জমি। "উঁচু পাড়ে উঠলে তবে জমিটি চোখে পড়ে এবং সবুজের সমারোহ দেখে ব্যাপারটি ভুতুড়ে লাগে।"[৩]

মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩-এ 'অমৃত' পত্রিকায়। এরপর গল্পটি ১৯৭৮ সালে 'অগ্নিগর্ভ' গল্প-সংকলনের অন্তর্গত হয়। অপারেশনবর্গাকে কেন্দ্র করে গল্পটির নির্মাণ, সেইসঙ্গে অনাবৃষ্টিও গল্পটিতে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী গল্পের শুরুতেই বলছেন, বাকুলি গ্রামটি যেন একটি বৃহৎ বেসিনের পেটের মধ্যে অবস্থিত। গ্রামের চারিদিকে জমি উঁচু ও গোল, পূর্বদিকে দেড় মাইল দূরে ক্যানাল। গ্রামে ১৯টি পরিবারের বসবাস। জনসংখ্যা হল ১০৯। উৎপন্ন শস্য ধান। কর্ষণযোগ্য জমি বেসিনের কানার বাইরে অবস্থিত। একটি বড় তেঁতুলগাছ, কয়েকটি আম, কাঁঠাল, শিরীষ ও পলাশ আছে বাকুলিতে। গ্রামে ধর্মঠাকুরের থান জাগ্রত। সেই গ্রামের সমস্ত কৃষিভূমির মালিক লক্ষ্মণ সামন্ত এবং ১৮টি পরিবার তার ভাগচাষী। গ্রামে জলের অভাব অত্যন্ত বেশি। লক্ষ্মণের বাড়িতে দুটি ইঁদারা ও একটি গভীর নলকূপ আছে। গ্রামের প্রাচীন পুকুরটি মজা, জলশূন্য। চার মাইল পশ্চিমে বয়ে চলেছে একটি খরস্রোতা নদী।

অপারেশন বর্গার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অস্থায়ী ঘরটি অ্যালুমিনিয়ামের। কুলিরা সারাদিনব্যাপী জল টিপে দিতে অন্তত বার দশেক পাইপ দিয়ে ঘরটি ভেজায়। ঘরকে শীতল করার অন্য কোনো উপায় বার করা সম্ভব হয়নি। প্রবল খরা, ফাল্গুন অতিক্রম করে আষাঢ় আসলেও বৃষ্টির দেখা নেই। সূর্য সব সময় প্রবল উত্তাপ দিতে থাকে। মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন যে, আটটা বাজলেই দিগন্তরেখা ও আকাশের মাঝখানে বাতাস উত্তাপে কাঁপে, মনে হয় দিগন্ত ব্যেপে প্রেতপ্রেতনী নৃত্য করছে। বাতাসে কাঁকড় ওড়ে, আকাশ ধুমল এবং ভয়ঙ্কর দেখায়।

লক্ষণ সামন্ত কখনোই চাননি ভাগচাষীরা জল নিয়ে চাষ করে তাকে বিঘা প্রতি ধান বেশিবেশি দিক। নিজেদের খোরাকি পাক। বাবুরাও চাননি চাষ ভালো হোক। কেননা, দুর্ভিক্ষ থাকলে তবে সাহায্য খয়রাতি আসে। "দুরন্ত খরা, জলাভাবে পোড়তলায় চারা-ধান খাক হয়ে যায়। জল পেলে তবে ধান নাড়া চলত। ক্যানালে অনেক জল। সকলের চোখের সামনে দিয়ে ক্যানাল দিয়ে জল বয়ে যায়, রাতে জলের গর্জন শোনা যায়। জলের অভাবে চাষ হবে না। ক্যানালের দু-তীরে বিঘার পর বিঘা জমি বন্ধ্যাত্বের ক্ষোভে ও বেদনায় ফেটে চৌচির হবে।"[৪]

তের দিন মাথায় জল পড়েনি। নির্ভরসা একটি জালা আঁকড়ে চোখ বুজে বসে থাকেন। জালা আঁকড়ে ঘুমোন। মেয়েরা শেষরাতে মজাদীঘি খুঁড়ে জল আনেন, জালায় জল ঢালেন। তের দিন সেই জল মেপে মেপে নির্ভরসা প্রত্যেককে দেন। সকলে পোড়া ধান নখে খুঁটে চাল বার করে খান। সবাই তেঁতুল গাছের নিচে বসে থাকেন। সরযূ কখনো গাছে উঠে তেঁতুলপাতা ছিঁড়ে সবাইকে দেন। টক তেঁতুল পাতা চিবলে লালা কাটে, গলা ভেজে। কিন্তু শরীরের জলের অভাবে তাদের তেমন আর কাটেনা।

নির্ভরসা মনোস্থ করেন ধর্মঠাকুরের পূজা করতে। ঠিক হয় সরযূ রক্ত দেবেন। সরযূর বুক ঠেলে 'নিরশ্রু' কান্না উঠে আসে। তার মনে পড়ে স্বামী গোকুলের কথা — "সে তো বলত, যে-কাজে পাঁচজনের ভালো হয়, সে-কাজ করতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়?"[৫] সকাল দশটাতে খরতপ্ত রৌদ্রে বাকুলি জ্বলতে থাকে। রাত দশটাতে অ্যালুমিনিয়ামের ঘরে বসে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দেখেন বাইশটি মানুষ কিছু করছেন। ক্যানালে ও নদীতে কড়া পাহারা। তবে তারা কি করছেন, তিনি তা বুঝতে পারেন না। রাতের জ্যোৎস্না ও ক্যানালের জলের শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে, কান্নাভরা গলায় 'জল দাও' বলে প্রার্থনা করেন তারা।। কর্মকর্তা লক্ষ করেন, "মেয়েটা 'জল দাও' বলতে বলতে ঘুরতে লাগল। 'বিশ্বভুবন জ্বলে গেল ঠাকুর, জল দাও।'"[৬] কিন্তু জল হয় না। সূর্য উত্তাপ ঢেলে দেয়। বাতাস জ্বলতে থাকে। রুক্ষ ও দগ্ধ প্রান্তর ধরে হাঁটতে হাঁটতে সরযূরা সড়কে ওঠেন। বাসের জন্য প্রতীক্ষা করেন। বাস তাদের না নিলে তারা হেঁটে সদরের জন্য রওনা হবেন। সরযূ বলেন— "যারা গোকুলদের ধরাল তারা বাঁচল না। জল ডেকে বুক চিরে রক্ত ফেলালাম জল হল না। তারা বা গোকুলদের ধরাল কেন, আমি বা রক্ত দিলাম কেন?"[৭]

সাতের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক হলেন ভগীরথ মিশ্র। পরিবেশবিষয়ক গল্পের ধারায় তাঁর 'খরা' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। গল্পের প্রারম্ভেই *উত্তরণ* সংস্থার সভাপতি আদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে জানিয়ে দেন, সমগ্র

রাজ্যব্যাপী চলছে এক প্রবল খরা। সারা রাজ্যে অবস্থিত অগণিত মানুষ তার করাল গ্রাসের কবলে পড়লেও তার তীব্র দহনে পুড়ছে তাঁর নিজের জেলাটি। জেলার প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ আসন্ন মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সভাপতি মহাশয় অসহনীয় খরা পরিস্থিতির স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তাদের বক্তব্য পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করেন।

প্রথমেই তিনি আহ্বান করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী সতীনাথবাবুকে, যিনি 'উত্তরণ'-এর সভাপতি পদের একজন শক্তপোক্ত দাবিদার। ফলত, আদিনাথবাবুর সঙ্গে বাহ্যিকভাবে তার সম্পর্ক মধুর দেখালেও বাস্তবে একেবারেই উল্টো। সতীশবাবু বলেন, খরাপীড়িত মানুষ পয়সার অভাবে আদালতে আসতে পারছেন না। তারা সমস্ত ধরনের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। এরূপ পরিস্থিতি পূর্বে হয়নি। খরাচলাকালীন তিনি সপরিবারে দীঘা যান। তিনি প্রত্যক্ষ করেন, পথের দু'ধারে আদিগন্ত জ্বলে যাওয়া মাঠ। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। রাস্তায় যতবার গাড়ি থেমেছে, ততবার কাতারে কাতারে উপোসি মানুষ ভিড় করেছেন গাড়ির চারপাশে। তাঁর মতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর এই খরাতে বাংলাদেশ পুনরায় বেহাল হয়। পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় নিরন্তর বেড়ে যায় ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান। সতীশবাবুর আপাত দয়াবান ব্যক্তিত্বের নেপথ্যে নিহিত আত্মসর্বস্বতা। খরার কারণে দরিদ্র মানুষদের যন্ত্রণা লাঘবের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা, এমনকি শুধু ইচ্ছাটুকুও তার ও তাদের মতো আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের নেই। বৃহত্তর সমাজের এই কুৎসিত রূপটি ভগীরথ মিশ্র পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দেন।

পঞ্চম বক্তা সুকেশ মজুমদার খরা পরিস্থিতির পরোক্ষ ফল হিসাবে গুরুতর বিপদের ইঙ্গিত দেন— "মাটির তলায় যদি জল না থাকে, যেটুকু রয়েছে তা যদি গভীর ও অগভীর নলকূপ দিয়ে পাগলের মতো তুলতে থাকে মানুষ, তবে অচিরেই জলের লেয়ারগুলো ভ্যাকম হয়ে যাবে। তার ফলে যে কোনো সময় ওপরের মৃত্তিকার স্তর ধ্বসে বসে যেতে পারে। হতে পারে বিধ্বংসী ভূমিকম্প। মহাভাবনার কথা।"[৮] বলাবাহুল্য অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ার ফলে মানবসভ্যতা তীব্র সংকটের মুখোমুখি হতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জল উপযুক্তভাবে সঞ্চিত করে না রেখে ভূগর্ভস্থ জলকে ক্রমাগত তুলে নিলে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। প্রতিমুহূর্তে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহার করতে থাকলে সেই দিন আসবে, যখন আর কিছু করার থাকবে না। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে হয়তো সাময়িক আরাম মেলে, কিন্তু তাতে করে ভবিষ্যতের মানুষেরা স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকারকে হারিয়ে ফেলেন। খরা নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই সুস্থায়ী উন্নয়ন, উন্নয়নের নামে অপচয় বন্ধ অত্যন্ত জরুরি। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পৃথিবীর বাতাসকে উত্তাপে ভরিয়ে তোলে। আর অতিরিক্ত উত্তাপ খরা তৈরিতে যে সহায়ক, সে বিষয়ে মতান্তর নেই। লক্ষণীয়, আলোচ্য গল্পটির এক বক্তা বলেন—"উহ্! আজ কী গরম! দুপুর থেকেই লোডশেডিং! অসহ্য!"[৯] মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিচারী মন ও মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আলোচনাচক্রটির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে যায় অনায়াস ভঙ্গিমায়। ভারতবর্ষে অচিরাচরিত শক্তি যথাক্রমে সূর্য, বায়ু, সমুদ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও তার প্রসার ঘটেনি। কয়লা ও খনিজতেল দহন করেই শক্তির চাহিদা মেটানো হয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে জমতে থাকে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা পৃথিবীর তাপমাত্রাকে নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বাড়িয়ে দেয়। উষ্ণায়নে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য। বিদ্যুৎচালিত পাখা, এয়ার কুলার, এসি সমস্ত কিছু আপাতভাবে গৃহপরিবেশকে শীতল করলেও তা বৃহত্তম পরিবেশের উপর কুপ্রভাব ফেলে। আর্থিকভাবে সচ্ছল মানুষের আরামপ্রিয়তা প্রকৃতি-পরিবেশের শৃঙ্খলাকে ওলট-পালট করে দেয়, যা মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এবং সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপদজনক। প্রকৃতিতে সমস্ত কিছুর সঙ্গে সমস্ত কিছুর নিবিড় সম্পর্ক। খরা, বৃক্ষহীনতা, বায়ুদূষণ বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। রঘুপতি সান্যাল বলেন— "আমার মতে এই পাকা বাড়িগুলোই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য দায়ী। যেভাবে দিনদিন ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে...।"[১০] স্মর্তব্য, রঘুপতিবাবুর কথায় ক্রুদ্ধ হন সর্ববিষয়ে বিশারদ দুঃখভঞ্জন রায়। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর ১৯৭৪-এর ৫ ই জুন প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয় বিশ্বপরিবেশ দিবস। প্রতিবছর এই দিবস পরিবেশ

সচেতনতার লক্ষ্যে পালিত হয়ে আসছে। শহরাঞ্চলে যত্রতত্র ইঁট-বালি-সিমেন্ট-ইস্পাতের সমন্বয়ে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কংক্রিটের বাড়ি দিনের বেলায় অত্যন্ত বেশি মাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাত্রে সেই তুলনায় শীতল হয় না। প্রতিদিনই কিছু কিছু উত্তাপ ধরে রাখে। কালক্রমে সমস্ত শহর জুড়ে একটি উত্তপ্ত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। জন্ম হয় একটি স্বতন্ত্র আবহমণ্ডলের। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যা মাইক্রো-ক্লাইমেট নামে পরিচিত। মাইক্রো-ক্লাইমেটে উষ্ণতা থাকে অনেক বেশি। বৃষ্টিপাত যায় কমে। 'উওরণ' শীঘ্র একটি পাকা বাড়ি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলতে মনস্থ করে। প্রসঙ্গত শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে গ্রামেও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য কংক্রিট ও পিচের রাস্তা বেড়েছে বহুগুণ। গৃহাঙ্গন আচ্ছাদিত হয়েছে শানবাঁধানো চাতালে। বাস্তবিক মৃত্তিকাকে এভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলার ফলেও উত্তাপ বাড়ছে। তাছাড়া বৃষ্টির জল ভূগর্ভে যেতে পারছে না।

দ্বিতীয় দল খরার জন্য দায়ী করে বৃক্ষহীনতাকে— "শতকরা তেত্রিশ ভাগ ভূমিতে গাছ না থাকলে সে দেশে খরা হবেই। এ জেলায় তেরো ভাগও নেই।"[১১] লক্ষণীয়, এই তথ্য ১৯৮১ সালের। ক্রমাগত গাছ কাটা পড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত কুন্তক চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্টটি। তিনি লিখেছেন, ১১টা বাজার আগেই রাস্তাঘাট কার্যত ফাঁকা হয়ে যায়। প্রবল গরম হাওয়া। রাস্তার দু'পাশে যতদূর চোখ যায় শুধু ধু ধু প্রান্তর। বিদর্ভের বেশ কিছু এলাকার জমি আধা-মরু হয়ে গেছে। ভূগর্ভের জলস্তর এতটাই নিচে নেমে গেছে যে, তা চট করে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। মাটি ফোঁপরা হয়ে গেছে। বর্ষাকালেও আকাশ ঘন নীল। তীব্র দাবদাহে ডালিমের ক্ষেত শুকিয়ে কাঠ। কলাবাগান, পেঁপেবাগান নষ্ট। গাছের ছায়াও যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। সড়কের দু'পাশে যত বড় বড় গাছ ছিল রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য সবই কাটা পড়ে যায়। অথচ বৃষ্টিপাতের জন্য গাছ অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত খরাপ্রবণ এলাকায় গাছ বেশি প্রয়োজন। বেশ কিছু বছর আগে থেকেই জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি কার্পাস দিয়ে চলছে চাষ। বেশি লাভের লোভে মাটিরতলা থেকে নির্বিচারে তোলা হচ্ছে জল। তার ফলে ভূগর্ভের জলস্তর নামছে। শুখা এলাকাতেও গড়ে উঠছে ইস্পাত কারখানা। নির্বিচারে তুলে নেওয়া চলছে ভূগর্ভের জল দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের সংকট।[১২]

জলযোগের পর দ্বিতীয় পর্বে দলগত আলোচনায় প্রথম দল উল্লেখ করে যে, স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের অবিমৃষ্যকারিতায় বেশকিছু খরাপ্রবণ অঞ্চল গড়ে উঠেছে। বাস্তবিক সবুজ বিপ্লবের ফলে ভূগর্ভ থেকে যে বিপুল পরিমাণে জল উত্তোলিত হয়েছে, তা পুনরায় ভূগর্ভে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। নিরন্তর জল তুলে নেওয়ার ফলে জলাশয়গুলির জলস্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। কিছু কিছু নদী, বিল মানুষের হঠকারিতায় হারিয়ে গেছে বা যেতে বসেছে। তাছাড়া বিপুল পরিমাণে বৃক্ষনিধনের ফলে আবহাওয়া হয়ে উঠেছে অত্যন্ত উষ্ণ প্রকৃতির। আর সব কিছু মিলিয়ে বৃষ্টিশূন্যতা দেখা গেছে। জনৈক বক্তা সুকেশবাবু বলেন, আকাশে জল না জমবার পিছনে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা আছে। বৃহৎ শক্তিগুলো ক্রমাগত পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের পথে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বহু সংস্থা আয়োজন করে চ্যারিটি শো। এই সমস্ত সংস্থা জনগণের হিত করার চেয়ে অনেক সময় নিজেদের স্বার্থচরিতার্থ করতেই বেশি উৎসুক থাকে। ফলত 'উত্তরণ' খরা নিয়ন্ত্রণের জন্য চ্যারিটি শো-র বন্দোবস্ত করাকে অমর্যাদাকর বলে গণ্য করে। সভায় স্থির হয় 'উত্তরণ'-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র *সবুজ সংকেত*-এ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। সতীশবাবুর অভিমত— "হাতে-নাতে কিছু করা দরকার। তা এস না। সবাই মিলে একটা মজে যাওয়া পুকুর সংস্কার করি। নিজেরা গায়েগতরে খাটি। খালি বক্তৃতা আর রেজুলুশন করে লাভটা কী?"[১৩] পুকুর সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণার পর সংস্থার একজন সদস্য জানান পুকুর পাওয়ার যদি অসুবিধা হয়, তবে তিনি শহরের লাগোয়া তার পুকুরটি সংস্কার করার জন্য দিতে পারেন। বন্ড দিতে তিনি রাজি। আর একজন বলেন, তারও পুকুর আছে। তিনিও সেটি সংস্কারের কাজে দিতে চান। একজন বলেন, তাদের অধ্যাপক বন্ধু আদিনাথবাবু কি তার ছাত্রদের তাদের সংস্থা, উত্তরণ-এর, কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেন না! আদিনাথবাবু জানান, কলেজ ইলেকশনের জন্য তা সম্ভব নয়। বাস্তবিক ক্ষমতায়নের রাজনীতিই মুখ্য হয়ে ওঠে। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে

রক্ষা করার বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। জনৈক ব্যক্তি জানান, প্রথম দিন পুকুর পাড়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। ফটো-তোলা বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অপর এক সদস্য চান সেই অনুষ্ঠানে ডি.এম. পৌরোহিত্য করলে তাদের প্রচেষ্টা অনেক বেশি সমাদৃত হবে। পুকুর কাটার ফটোটি তাদের পত্রিকার প্রচ্ছদ হতে পারে। পরিশেষে দেড় ঘন্টাকালীন আলাপ-আলোচনা বানচাল হয়, হঠাৎ বৃষ্টির আগমনে। আর সতীশবাবু অকস্মাৎ বোমার মতো বিস্ফোরণ ঘটান। তার মনে হয়, প্রবল বর্ষণের পর সভাপতি আদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর ঐ পদে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। ঐ মুহূর্তে তাঁর পদত্যাগ বাঞ্ছনীয়। আদিনাথবাবু জানতে চান যে, তিনি কী অপরাধ করেছেন। সতীশবাবু বলেন— "অপরাধ? আজ দশ মাস ধরে জ্বলছে এই জেলা। সংস্থার পক্ষ থেকে আজ অবধি কেন কোনোও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? কেন আজ আমাদের এমনভাবে বেইজ্জত হতে হলো তার জবাব চাই।"[১৪]

পুরুলিয়া জেলার রুক্ষ প্রকৃতি-পরিবেশকে নিবিড়ভাবে যেমন চেনেন, ঠিক তেমনি গভীরভাবে তাকে ভালবাসেন সৈকত রক্ষিত। তাঁর 'খরা' গল্পটি সেই ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। গল্পটিতে তিনি লিখেছেন, বেলা চড়চড় করে বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে রোদের তেজ। সময়ের হিসাবে বর্ষাকাল শেষ হতে চললেও বৃষ্টির দেখা মেলেনি। মাটিকাটা, চালাঘর মেরামত করা যে কোনো ধরনের কাজে যে কোনো খোরাকির বিনিময়ে পল্টন খিদে মেটাতে চান। খরুর বাড়ির মজে যাওয়া কুঁয়ো পরিষ্কার করতে আসেন তারা। হাওয়াতে কোনো শীতলতা নেই। কেবল হলকার তীব্র অনুভূতি মিশে থাকে। সামান্য খোঁড়াখুঁড়িতে জলের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে জলস্তর নেমে গেছে কয়েক হাত নিচে। তাই ইঁদারাতে মেয়েরা দড়ির সঙ্গে জুড়ে দেন ছেঁড়া শাড়ি। খরুকে জল পেতে হলে কয়েক দিন মুনিষ লাগাবার প্রয়োজন।

গুইহার পুত্রের নিরঞ্জন কুইরির খড়বাঁধা কলে চাকরিটি আর নেই। কারণ কৃষিকাজ তেমন লাভজনক নয় বলে কলে খর আসা বন্ধ। ধান রোপনের সময় বৃষ্টি না হওয়ায় রৌদ্রে পল্টনের জমির সমস্ত চারা শুকিয়ে যায়। দ্বিতীয়বারের জন্য রোপনের বন্দোবস্ত করবার সংগতি তার হয়নি—

> যারা ফেলেছে, দু-একটা বর্ষা পেয়ে তড়িঘড়ি লাঙল ঘুরিয়ে চারা পুঁতেছে, তারাও এখন আসমানে চেয়ে হা-হুতাশ করছে। কবে প্রকৃতির উদার অনুগ্রহ নিয়ে দুড়-দাড় করে নেমে আসবে বৃষ্টি!
>
> তেমনভাবে বর্ষা-বারিশের আর প্রত্যাশাও করে না পল্টন। সে এখন এসে ঠেকেছে তার চূড়ান্ত দশায় । সর্বস্ব হারাবার পরও মানুষের সম্বল থাকে তার দুটো হাত। এই হাহাকারের বাজারে পয়সা দিয়ে তা-ও যখন কেউ খরিদ করতে চায় না, তখন, সে কার মুখাপেক্ষী হবে? প্রকৃতি না মানুষ?
>
> প্রথম প্রথম সেও কয়েকদিন রিলিফের কাজ পেতে ধরনা দিয়েছিল পঞ্চায়েতের অফিসে। বাঁধ সংস্কার, রাস্তা তৈরি ইত্যাদি কাজ। কিন্তু সেখানে গিয়ে লখা-নিত্যানন্দ-জগবন্ধুর মতো সে কেবল হতাশই হয়েছে।
>
> দারিদ্রের চাপে, কখনো কখনো, অক্ষম আক্রোশ জাগে পল্টনের।[১৫]

পল্টনের সঙ্গী আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভব করতে পারেন দূরের প্রান্তর জোড়া ধান ক্ষেতের রুক্ষতা। হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশের ঘরবাড়িগুলিতে তার 'জোরজবরদস্তি' ঢুকে পড়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে— "প্রকৃত অনাহারী এবং বঞ্চিত মানুষের জ্বালা নিয়ে কাতর হয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, 'বাবু, হামরা পেট-পেট করে মরে যাচ্ছি। কিছু কাম দেন। হামরা কুয়া ঝালাই। দেয়াল তুলি। চাল ছাওয়া-ছায়ি, চুন পচড়া করা, মাটি কাটা, খাট বুনা সোব—হামরা জানি।'"[১৬] লখার বাবা বুঝতে পারেন না কীভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। ঝরিয়া কিংবা ধানবাদ গেলে খাদানে কাজ পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও তিনি সন্দিগ্ধ। লখা ভাবে, যদি বৃষ্টিপাত হয় তবেই হাড়ি-কলসি গড়বার চাকা স্ত্রী গান্ধারীর নিপুণ হাতের ছোঁওয়ায় আবার ঘুরতে শুরু করবে—

> ঘুরুক। ঘুরে যাক। লখার মনে যেন আক্রোশ জাগে। মিনমিনে ফোঁটা নয়, এবার সর্বগ্রাসী বৃষ্টি এসে ডাবহার পুকুর-খেত-খলিহান সবকে-সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক!

কিন্তু প্রকৃতি যে খামখেয়ালি। কিষ্ট নিজের মনেই বলে, 'মরণ ধরন পানি/ তিন নাই জানি। মেঘ ঘুনালে জল হবেক—কে বলতে পারে?'[১৭]

ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষজন ভাটায় কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়। গ্রামত্যাগে কারুর মনই সায় দেয় না। তবু অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে তারা অন্যত্র যান। খাটের পায়া দুই পাশে খুলে দড়ির ভিতর পাকিয়ে নেন ছেঁড়া কাঁথা, গামছা-কাপড়-কাঁথা, দু-এক মুষ্টি চিঁড়ে-মুড়ি। তারা প্রত্যাবর্তন করবেন রোহিণীর পরবে, যখন বর্ষার জন্য ভাটার কাজ বছরের মত শেষ হবে। সবাই গ্রামত্যাগী হতে পারেন না। হতে পারেন না পল্টন। অভিমান তার গলায়—"গা ছাইড়ে হামি যাব না লখা। তুঁই যা। না খাঁইয়ে শুকাঁয় যদি মরি, ত হামি গায়েঁই মরব।"'[১৮] গল্পের সমাপ্তিতে সৈকত রক্ষিত লেখেন— "খাঁ খাঁ গ্রামটার দিকে তাকিয়ে থাকে পল্টন। প্রকাণ্ড শূন্যতায়, এই প্রথম চোখ তার ছলছল করে!"[১৯]

অনাবৃষ্টি প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানবকে এক তীব্র সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, তেমনি একটি গল্প অমর মিত্রের 'আবহমান'। "শুকনো মাংসহীন দুটো পা খেজুর গাছের কাণ্ড এমনভাবে শুয়ে আছে যেন এই এখনই শুকনো হাত পা দিয়ে মইদুল উঠে যাবে অঘ্রাণের নির্মেঘ নীলিমায়"।[২০] ভাঁড় না পেতেই মইদুল নেমে আসেন। দুই দুই বার কাটা সত্ত্বেও ভার পাতা হয় না। রুজি রোজগারের কোনো বন্দোবস্ত হয় না। অন্নসংস্থানের জন্য ভিটেমাটি বিক্রি করবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। অগ্রহায়ণ মাসে মাঠে ধানের গোড়া দেখা যায় না, দেখা যায় না গরুর গাড়ির চাকায় তৈরি পথ। মাঠে ফসল হয়নি। ফলত মাঠে গাড়ি না নামাই স্বাভাবিক। কারও উঠানে ধানের গাদা নেই। অগ্রহায়ণ মাসেই তাই ভাতের অভাব দেখা দেয়। সামান্য জমিতে যে আধপোড়া ধান ফলে, তা মইদুল কেটে নেন। সেই ধান যেন ধানের প্রেত ছায়াসম। মইদুল আর তার পিতা আকবর অনাহারে এমন হয়েছেন যে তাদের মানুষ বলে প্রতিপন্ন করতে সংশয় জাগে। শীত পড়েনি বললেই চলে। ফলে খেজুর গাছে রসের বড়োই অভাব। ছোট গাছটিতে মইদুল ভাঁড় পাতেন। লালরঙের রঙের সুস্বাদু জিরিন রস হয়। কিন্তু বড় গাছটি ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে—"আর ক্ষমতা নেই মাটির খুব গভীরে শিকড় নামানোর। মাটির রসই তো শিকড় বেয়ে উঠে ওর সারা অঙ্গ রসবতী কর তুলবে।"[২১] জলস্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। অথচ বিশ্বে একসময় ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার ছিল ভারত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে সেই জল তুলে ফেলার ফলে বেশ কয়েকটি এলাকায় সারা বছর ভূগর্ভস্থ জল থাকে নামমাত্র। প্রাচুর্য থেকে এখন সেখানে খরা। বিশ্বের স্থলভূমির মাত্র দুই শতাংশ ভারতে থাকলেও বিশ্বের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হলো ভারতের জনসংখ্যা। ভূগর্ভস্থ জলের উপরে চাপ ভারতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি। আমিনপুরের রফিক মণ্ডল ছিলেন মাছের ভেড়ির পাহারাদার। ভাদ্রমাসে ভেড়ির নোনাজল বিদ্যাধরীর খাঁড়ি পথে বের করে দিয়ে মালিক সেখানে ধান বুনতে উদ্যোগী হন। নোনাজল বৃষ্টিতে মিঠে হয়ে যায়। আবার মাছের চাষ হবে মাঘ মাস নাগাদ। চাষের কাজের জন্য অন্য জায়গার লোক শ্রমিক হয়ে আসেন। রফিক বেকার হয়ে পড়েন। অর্থাভাব অন্নাভাব রফিককে পাগল করে দেয়—"ছ-ফুট বাশেঁর মতো লম্বা রফিক মণ্ডল এখন ঘুরে বেড়ায় আর বলে, মাঘ মাসটা আসুক।"[২২] অভাবের কারণে স্ত্রী সোনাভান শিশুপুত্রসহ স্বামী সংসার ত্যাগ করে আসেন মইদুলের কাছে। সেখানেও শান্তি মেলে না। খেজুর গাছ নিয়ে পিতা-পুত্র মইদুল ও আকবরের নিত্যবিবাদ। আকবর রসবতী খেজুর গাছটাকে নিজের বলে দাবি করেন। সোনাভান শ্বশুরমশাইকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চান যে, প্রত্যহ আকবরকে রস খেতে দেওয়া হবে। কিন্তু পুত্র মইদুল তাতে রাজি হন না। কারণ মইদুল সবটা রস বিক্রি করতে চান—

> কী করে হবে, রস আমি যে পেত্যেক দিন ব্যাচপো, তিন তিন ছ-টাকা, কেডা দ্যায় বল এরাম অভাবের কালে?
>
> বিবি চুপ করে থাকল, মাথা দোলাতে লাগল। ঠিকই তো বলেছে মানুষটা। কটা দিন ওই রসই যে বাঁচাবে। ও থেকে বুড়োর খেয়াল মেটাতে গেলে যে দিনভর উপোস দিতে হবে।[২৩]

আকবর গুম হয়ে বড় খেজুর গাছটার দিকে তাকায়। তার পিতামহের আমলের গাছ। আকবরের মনে হয় গাছটি রস টেনে টেনে শুকিয়ে ফেলছ মাটির বুক। মৃত্তিকা দুগ্ধশূন্য হয়ে পড়ছে। গাছটির ভিতর ফোঁপরা। বিগত বছরে বর্ষা নামেনি,

বর্ষা কেমন হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন আকবর। মইদুলের মনে হয় বিবির প্রথম স্বামী রফিকের যেমন— "মাঘ মাসটা আসুক... বাপের তেমনই খেজুর গাছ...।"[২৪] হায়দারের কূটকৌশলে আকবর রসবতী গাছ দুটিকে নিজের অধিকারে রাখেন। অভাব মইদুলের সংসারে তীব্র আকার ধারণ করে। দিশাহারা মইদুল চান রফিকের মত আকবরের মস্তিষ্কের স্থিতাবস্থাও বিনষ্ট হোক। মইদুলের দৃঢ়বিশ্বাস আলোকলতার বিষে রফিককে পাগল বানিয়েছেন সোনাভান। ক্রন্দন চাপা দিতে ব্যর্থ হন সোনাভান। অন্নাভাবেই রফিক পাগল হয়ে যান। অন্নাভাবেই সোনাভান রফিককে ছেড়ে মইদুলের গৃহিণী হন — "পেটের জ্বালায় অভাবে তোমার রফিক ভাই পাগল হলি আমি ভাতের জন্যি তোমার এহেনে এসে উঠিছি মিঞা, তারে আমি পাগল করি নাই। বিশ্বাস কর আমি তারে আলোকলতার রস খাওয়ায় নাই, অভাবে নিকে করলাম, হায় মানুষ কি মানুষের জেবন নষ্ট করতি পারে!"[২৫]

যে অভাব রফিককে পাগল করে তোলে সেই অভাবই মইদুল ও আকবরের চিরায়ত পিতা-পুত্রের পুত্রের সম্পর্ককে বিনষ্ট করেছিল। অভাবেই সোনাভান ও রফিকের দাম্পত্যের মধুরতা হারিয়ে গিয়েছিলা বেঁচে থাকার প্রত্যাশায় সোনাভান আশ্রয় খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন মইদুলের মধ্যে। মানুষের কার্যকলাপে পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু বিপর্যস্ত। মানুষের অদূরদর্শী কার্যকলাপে বিনষ্টপ্রায় প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য। অনাবৃষ্টিতে, জলাভাবে রফিক ও মইদুলের মত মানুষগুলোর জীবনযাপনের প্রচলিত ধারা অনিশ্চিত ও সংকটাপন্ন।

খরা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। খরার জন্য মুখ্যত প্রান্তিক মানুষজনকে তীব্র সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে খরাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অনেক বেশি সক্রিয়। আর ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প থেকে স্পষ্ট, আজকের পৃথিবীতে খরা কেবলমাত্র একটি প্রাকৃতিক বিষয় হয়ে থাকছে না, কারণ খরাসৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল। মানুষের ভোগবিলাস আরামপ্রিয়তা প্রকৃতি-পরিবেশকে ক্রমশ বেসামাল করে তুলছে। তার ফলে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বেড়ে গেছে বহুগুণ। সৈকত রক্ষিত এবং অমর মিত্রের গল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন ও জীবিকার তীব্র সংকট পরিলক্ষিত হয়। মোটকথা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গ। দারিদ্র্য ও লোভ দুই-ই পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। লাগামহীন ভোগবাসনা অনাবৃষ্টিসহ নানা সংকট পরিবেশে নিয়ে আসে। আর সেই পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষার কারণে জেনে বা না-জেনে দরিদ্র মানুষ নিজেরা যেমন জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলেন, তেমনি নিজেদের অগোচরে বিনষ্ট করে ফেলেন প্রকৃতি-পরিবেশের সুস্থতাকেও। খরা মানব সম্পর্কের মধ্যেও তীব্র দ্বন্দ্ব তৈরি করে, যা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ অনেক সময় খুঁজেই পাওয়া যায় না।

সূত্র নির্দেশ:

১. রীত, প্রত্যুষকুমার, (২০১২), *ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের গল্প,* পুনশ্চ, পৃ. ৫০৪।
২. দেবী, মহাশ্বেতা, (১৪০০), *স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প,* প্রমা প্রকাশনী, পৃ. ৬।
৩. *তদেব,* পৃ. ১০৫।
৪. *তদেব,* পৃ. ৫৭।
৫. *তদেব,* পৃ. ৬০।
৬. *তদেব,* পৃ. ৬১।
৭. *তদেব,* পৃ. ৬১।
৮. মিশ্র, ভগীরথ, (২০১০), *সেরা ৫০টি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৭০।
৯. *তদেব,* পৃ. ১৭৫।

১০. *তদেব,* পৃ. ১৭২।
১১. *তদেব,* পৃ. ১৭৩।
১২. https://www.anandabazar.com/india/drought-situation-is-worsening-in-vidrabha-1.1007001, accessed on 10th April, 2022.
১৩. ভগীরথ মিশ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৭৭।
১৪. *তদেব,* পৃ. ১৭৯।
১৫. রক্ষিত, সৈকত, (২০১৫), *উত্তর কথা: সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ,* পারুল, পৃ. ২৪৯।
১৬. *তদেব,* পৃ. ২৫৩।
১৭. *তদেব,* পৃ. ২৫৫।
১৮. *তদেব,* পৃ. ২৫৫।
১৯. *তদেব,* পৃ. ২৫৫।
২০. মিত্র, অমর, (২০০৮), *দশটি গল্প,* পরশপাথর প্রকাশনী, পৃ. ৯।
২১. *তদেব,* পৃ. ১১।
২২. *তদেব,* পৃ. ১৩।
২৩. *তদেব,* পৃ. ১৩-১৪।
২৪. *তদেব,* পৃ. ১৪।
২৫. *তদেব,* পৃ. ১৮।